এমপি'র দৌড়

খুব কেঁদেছেন তিনি। কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেলেছেন একেবারে। না, সিনেমা দৃশ্যের কোন গ্লিসারিনলিপ্ত কান্না নয়, অন্তরের অন্তস্থল থেকে উঠে আসা আদি ও অকৃত্রিম কান্না। মাঠে ময়দানে বক্তৃতাকালে ঠিক সময়ে যাতে চোখে জল আসে সেজন্যে আগেকার দিনে নেতারা মরিচের গুড়াভর্তি রুমাল রাখতেন পকেটে। সময়মত রুমালটা বের করে চোখে লাগালেই কেল্লা ফতে। হুড়হুড় করে জল এসে যেতো চোখে। নেতার চোখে জল, জনগণ কি আর ঠিক থাকতে পারে? তাদের চোখ দিয়েও জল বেরুতে- অর্থাৎ ভোট দিয়ে নেতার বাক্স ভরে দিতে দেরী হতো না তাদের। তাই দেখে আমাদের জাতীয় কবি নজরুল কৌতুক করে লিখেছিলেন- 'বক্তৃতা দিয়ে কাঁদিতে সভায়, গুড়ায়ে লঙ্কা পকেটেতে ঢোকা এই বেলা.....'।

আজকাল মানুষের মন-মানসিকতার বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে, প্রযুক্তিরও অনেক উন্নতি হয়েছে এখন। রাজনীতিবিদরা এখন বড়ো একটা কাঁদেন না, হুংকার ছাড়েন। ভোটারদের মন জয় করতে তারা এখন চোখের জলের পরিবর্তে চোখে আগুন রাখার চেষ্টা করেন। সাপোর্টার তথা ক্যাডারদের হাতে থাকে বোমা, পিস্তল। তাই বলে কান্নাপ্রথা যে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে তা নয়, সনাতনী এই প্রথাটা যে এখনও মরে যায়নি তার লেটেস্ট মহড়া দিলেন ম্যাডাম জিয়ার ডেমরা-শ্যামপুর এলাকার সিপাহসালার জনাব সালাহউদ্দিন। জনতার তাড়া খেয়ে মুক্তকচ্ছ হয়ে দেড়টনি বডি নিয়ে রাস্তার খানাখন্দ টপকে যেভাবে ছুটে পালাচ্ছিলেন তিনি- তা যেন অলিম্পিকের হার্ডল রেসকেও হার মানায়। ম্যাডাম জিয়ার বহুল-কথিত উন্নয়ন তত্ত্বের জীবন্ত উদাহরণ হয়ে বহুকাল মানুষের স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে থাকবে সেই দৌড়। পরের দিন বিটিভি'র ক্যামেরার সামনে যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে দুস্কৃতিকারীদের বিচার চাইলেন তিনি, সেই কান্নাদৃশ্যও মানুষের মনে বহুকাল জাগরুক থাকবে।

একটা বিষয় কিছুতেই হিসেব মিলছে না আমার। কানসাট, ধনবাড়ী এবং শনির আখড়ার ঘটনায় প্রমান হয়ে গেছে যে এই সরকারের উপর জনগণের আর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। এটাও প্রমান হয়ে গেছে যে নির্য্যাতনকারী লুটেরা সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর চিরকালীন বাঙালি চরিত্র একটুও পাল্টায়নি। জনতা যখন ফুঁসে উঠে, তার সামনে পুলিশ-র‍্যাব-সেনাবাহিনী সবই তাসের ঘরের মতো উড়ে যায়। দেশ অগ্নিগর্ভ হয়ে আছে, অথচ বিরোধী দল আহুত আন্দোলন কর্মকান্ডে জন-সম্পৃক্ততা দেখা যায় না। কোথাকার কোন রব্বানী, অচেনা অজ্ঞাত এক মাসুদ- তাদের ডাকে জনতা উন্মত্তের মতো ঝাপিয়ে পড়ে। অথচ বিরোধী দলগুলিতে এত ভোমা ভোমা বিদগ্ধ নেতানেত্রী থাকতেও তাদের ডাকে জনতা রাস্তায় নেমে আসে না। কেন? বিরোধী দলের আন্দোলন কর্মসূচী হতে জনগণ নিজেদেরকে সযত্নে দুরে সরিয়ে রাখছে, অথচ রাজনীতিবিবর্জিত যেকোন আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়ছে, মরছে, মারছে। শামসুন্নাহার হলের ঘটনায়ও আমরা দেখেছি, সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে সরকারের গদি টলিয়ে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল ও পুলিশদলের কোহিনুর মিয়াদের চোখ রাঙানিকে উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে এসেছিল তারা এবং সরকারকে নাকে খৎ দিতে বাধ্য করেছিল। ভিসি আনোয়ার চৌধুরিকে বলি দিয়ে তবেই সরকার পার পেয়েছিল সেবার। প্রতিটি ঘটনার আসামী সরকার, বাদী সাধারণ জনগণ। প্রতিটি ঘটনায়ই সরকারের আপাতঃ পরাজয় ঘটেছে।

এখন প্রশ্ন, রাজনীতিবিদদের দ্বারা প্রনীত কর্মসূচীগুলির প্রতি জনগণের এই অনীহা কেন? কানসাট, শনির আখড়া ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন স্থানীয় ঘটনা, কিছু লোকাল ইস্যুর কারনে গণঅসন্তোষ হঠাৎ করেই জ্বলে উঠেছে, আবার নিভেও গেছে। এই স্ফুলিঙ্গ দেশব্যপী ছড়িয়ে পড়বে এবং জাতীয় সমস্যা সমাধানে অর্থবহ ভুমিকা রাখবে এমন আশা করা যায় না। জনগণের পুঞ্জীভুত ক্ষোভকে পুজি করে কেন জাতীয় পর্য্যায়ে একটি আন্দোলন গড়ে উঠছে না, তার অন্তর্নিহিত কারণ খুজে বের করা জাতীয় নেতৃবৃন্দের দায়ীত্ব। তবে রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু বক্তব্য থাকে। অকিঞ্চিতকর হলেও এপ্রসঙ্গে আমার মুল্যায়ন পেশ করছি।

প্রথমতঃ- গোড়ায় গলদ নিয়েই বিরোধী পথে হাটা শুরু করেছিল আওয়ামী লীগ। ২০০১ সালের নির্বাচন যতোই প্রশ্নবিদ্ধ হোক না কেন, এতটাই সুকৌশলে তা সম্পন্ন হয়েছিল যে ফলপ্রকাশের পুর্ব পর্য্যন্ত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা পর্য্যন্ত টের পাননি যে ফলাফল কী হতে যাচ্ছে। বুঝতে পারেননি যে শতকরা একচল্লিশ ভাগ ভোট পেয়েও তাদের ভাগ্যে জুটবে মাত্র য়াটটি সিট। পোঁড় খাওয়া নেতারাই যা

আঁচ করতে পারেননি, সাধারণ জনগণ তা কী করে বুঝবে? তারা দেখেছে- অত্যন্ত শান্তিপুর্ণভাবে একটি নির্বাচন হয়ে গেল দেশে, দুনিয়ার সমস্ত রাষ্ট্র- এমনকি আওয়ামী লীগের পরম মিত্র হিসেবে পরিচিত ভারত পর্য্যন্ত এই সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্যে অভিনন্দন জানাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে জনসাধারণের নার্ভকে ভালভাবে ষ্টাডি না করে নির্বাচনের পরের দিনই সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিল আওয়ামী লীগ, আহ্বান জানাল নুতন সরকারের পদত্যাগের। স্বাভাবিক ভাবেই জনগণ আওয়ামী লীগের এই হঠকারী সিদ্ধান্তকে ভাল চোখে দেখেনি এবং এর সমর্থনে রাস্তার আন্দোলনে সামিল হওয়ার পেছনে কোন যুক্তি খুজে পায়নি। দ্বিতীয়তঃ- আওয়ামী লীগ কি সাফল্য লাভের লক্ষ্য নিয়ে আন্দোলন কর্মসুচী দিচ্ছে নাকি নেহায়েত নিয়মরক্ষার খাতিরে কর্মসুচী দিচ্ছে -সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে মানুষের মনে। নইলে কবে কখন কী কৌশলে প্রতিদ্বন্দীকে পদত্যাগে বাধ্য করা হবে, আগেভাগেই সেই ঘোষণা দিয়ে কেউ যুদ্ধ শুরু করে? এসএসসি পরীক্ষার দিন হরতাল ডেকে জনগণকে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়ে নেতারা পাজেরোতে চেপে বিজিনেস হাউজে যান? সরকার একটা ভুল করে তো সাথে সাথে বিরোধী দল তার চেয়ে বড় আরেকটা ভুল করে সরকারের ভুলটা চাপা দিয়ে দেয়। তা দেখে জনগণকে বলতে শুনেছি- বিএনপি চায় কোনমতে ক্ষমতা ছেড়ে ভাগতে, আওয়ামী লীগ চায় যেকোনভাবে বিএনপিকে ক্ষমতায় ধরে রাখেতে। জনগণ যতো অশিক্ষিতই হোক- তাদের বোধ হয় স্বাভাবিক কোন ইনষ্টিংক্ট আছে যার বদৌলতে তারা বুঝতে পারে- কোন্ আন্দোলনে জান বাজী রেখে লড়তে হবে, কোনটাকে জাষ্ট নেগলেক্ট করলেই চলবে। তার উপরে ছিল জোটশক্তির ভয়াল দন্ত-নখর, পুলিশের সাড়াশি পিটুনী, ক্রসফায়ার, এনকাউন্টার, আরও কতো বিভিষিকা। নেহায়েত বাধ্য করা না হলে কোন্ মা তার ছেলেকে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়? এক কথায় বলা যায়, বিরোধী শিবিরের আন্দোলন-কৌশলের দুর্বলতা, নেতাকর্মীদের নিস্ক্রিয়তা এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের নির্য্যাতনের ভয়ে মানুষ এতদিন আন্দোলনমুখী হয়নি। সরকারের কুশাসনের জবাব তারা ব্যালটের মাধ্যমেই দিতে পারবে- সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাই মনে করেছে এতদিন।

তবে দিগন্তে একটা পরিবর্তনের আভাস লক্ষ্য করা যায় ইদানীং। শুধু যে কানসাট শনির আখড়ায় হঠাৎ করে জনবিস্ফোরণ ঘটে যাচ্ছে তাই নয়, বিরোধী দল আহুত কর্মসুচীগুলিতেও জনতার অংশগ্রহনের পরিমান বাড়ছে, তাদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা ও জঙ্গীভাব বেশী করে দেখা যাচ্ছে। একে তো দ্রব্যমুল্য, বিদ্যুৎ-গ্যাস-পানি সঙ্কটে তাদের জীবন ওষ্ঠাগতপ্রায়। তার উপর আর মাস কয়েক পরেই একটি নির্বাচন আসছে এবং সেই নির্বাচনের মাধ্যমেই তারা তাদের রায় জানিয়ে দিতে পারবে বলে এতদিন যে আশা নিয়ে বসেছিল তারা- তা ধুলিস্যাৎ হতে চলেছে। তারা দেখতে পাচ্ছে, যে নির্বাচন কমিশন জাতিকে একটি সুষ্ঠু অবাধ নির্বাচন উপহার দেয়ার জন্যে সাংবিধানিকভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তা কীভাবে একটি দলের আজ্ঞাবহ দাসে পরিনত হয়েছে। এই কমিশন দিয়ে আর যাই হোক সুষ্ঠু নির্বাচন আশা করা যায় না। আন্দোলন ছাড়া এই ফ্যাসিষ্ট সরকারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার আর কোন রাস্তা খোলা নাই। জাতীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রতিদিন লুটপাট, অব্যবস্থার যে চিত্র প্রকাশিত হচ্ছে সেগুলি যতি সত্যি হয়, তাহলে এই সরকার কিছুতেই একটি অবাধ সুষ্ঠু নির্বচনের চ্যালেঞ্জে যেতে পারে না। কারণ সেক্ষেত্রে অনেক রাঘব-বোয়ালের ভাগ্যে এমপি সালাহউদ্দিনের মতো পরিনতি ঘটা অবধারিত। নির্বাচনের পর জনগণের ধাওয়া খেয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ীর নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে নোংড়া ম্যানহোল টপকে দৌড়ে পালিয়ে বেড়ানোর রিস্ক কেউ নিতে পারে না। প্রয়োজন হলে তৃতীয় অগণতান্ত্রিক কোন শক্তি ক্ষমতায় আসুক, তাদের জন্যে তাও মন্দের ভাল।

বাংলাদেশের মানুষ যতোই বিস্মৃতিপ্রবন হোক, সময়ের কঠিন বাস্তবতা তারা বুঝতে পেরেছে বলেই মনে হচ্ছে। এই গণরোষকে বিরোধী দলগুলি কোন্ কৌশলে মুক্তি ও সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাই শুধু দেখার বিষয় এখন। সেদিকেই তাঁকিয়ে আছে জাতি।

সগীর আলী খাঁন

১১-০৫-২০০৬